শ্রীকান্ত

দ্বিতীয় পর্ব

১

এই ছন্ন-ছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে; কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল তখন বুঝিলাম বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ি ফিরিয়া আসার পরে, আমার এই সুখে-দুঃখে-মেশানো জীবনটাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদ্‌লাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর একরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল—কোথাও যেন আর ঘর-বার আপনার পর রহিল না। এম্‌নি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে অন্তর-

বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনে হইল না। সংসারের কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এ সব অনেকদিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, তাহাই আমার পরম লাভ। অথচ হারাইয়াছি বলিয়াও কোন দিন ক্ষোভ করি নাই। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট্ শক্তি। আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্ব্বল হাতের উপর এত বড় গুরু-ভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুই হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু থাক্ সে কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল, অনেক দিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্তু! এত দিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি।

আকাশ-কুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা

শুক্‌না পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটী হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদি বা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয় ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এম্‌নি ভাবে আরও পাঁচ-ছয়মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলি কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্ব্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এই গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদি-বা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে! মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যতপ্রকারে কল্পনা করা যাইতে

পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ফাঁক, এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক্, গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়াছিলেন, তাহা মনে হইল না! বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই এই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম; কিন্তু এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায় সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য, একদিন রাত্রে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি ট্রেণে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া

এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সোপান স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কতটাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন, তাঁর কোন এক আত্মীয় বর্ম্মামুলুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান্ হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই ; কিন্তু সে কথা এখন থাক্। গঙ্গাজল-মায়ের বর্ম্মা মুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরে'টা কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল, সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্ব্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যত প্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে

আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম; কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরণ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাত-ছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া সুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ি, বিদ্যা-সাধ্যি দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষেও এমনও কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মূর্খ হইয়াও, শুদ্ধ মাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপর দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এ জন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই; কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিল রূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না—সে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাস-খানেক পরে যা হোক্ একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম;

কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লিখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নিচের বসিবার বারান্দায় দেখিলাম, দুইজন উর্দ্দীপরা দরওয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন মনে করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্ব্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরওয়ানজীর পরিবর্ত্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহারে দরওয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নিচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ

আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক্ হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন্ এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

এই মাত্র আস্‌চি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু! ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আস্‌চি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিবঠাকরুণ ওপরেই আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম; কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্ ধপ্ করিতেছে। তাকিয়াগুলায় ওড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জন-কয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরণে বাঙালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও মাথার উপর কাজ-করা মস্‌লিনের টুপিতে বেহারী বলিয়া মনে হইল। এক জোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবলচী এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম। পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোষাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজ-সজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে? যাক্, বাঁচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাই নে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে!

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক বলে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্ম্মায় যাচ্ছি। হয় ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখ্‌তে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরী হয়েছে, আসুন।

খুসি হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারি ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টা-খানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নিচে এসো— আমার আরও কথা আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম—

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নিচের ঘরে না ক'রে এ ঘরে করা হ'ল কেন?

রতন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, নিচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল।

সে অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নিচের ঘরে? আপনি কি যে তামাসা করেন

বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায় ?

রতন কহিল, বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড় হাত চওড়া তক্ত-পোষের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেল-ফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরী হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এ সব তাহারই স্বহস্তে-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্য্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম ; কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয় ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্ম্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানি নে।

তবে?

ফির্‌তেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো না কি?

কথাটা অতি সামান্য; কিন্তু সংসারে এই একটা ভারি আশ্চর্য্য যে মানুষের দুর্ব্বলতা কখন্ কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোন দিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানি নে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোন দিন ফিরে আসি ত শুধু তোমার জন্যই আস্‌ব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না; কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে ব'স; এ অবস্থায় কেউ দেখ্‌লে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্য্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর

[illegible] তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার [illegible] সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধ-স্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠ্‌ব!

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে কর নি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো? তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি তোমাকে, পুরুষমানুষ, যত মন্দই হয়ে যাক্‌, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই কর্‌তে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হ'তে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোন দিন মানা করি নে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া [থা]কিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আট্‌কাতে পার্‌বে না।

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাই ত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয় নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া, আমার পায়ের বালিসটা টানিয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে? এম্‌নি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া, কিসের জন্যে বর্ম্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?

চাক্‌রি কর্‌তে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল; কিন্তু আমাকে ঠকিয়ো না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি; এবং কি করতে বল তুমি?

করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধ-স্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠ্‌ব!

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে কর নি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো? তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি তোমাকে, পুরুষমানুষ, যত মন্দই হয়ে যাক্, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই কর্‌তে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হ'তে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোন দিন মানা করি নে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আট্‌কাতে পার্‌বে না।

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন ?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না ? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাই ত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয় নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি —আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া, আমার পায়ের বালিসটা টানিয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে ? এম্‌নি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া, কিসের জন্যে বর্ম্মায় যেতে চাচ্চ শুনি ?

চাক্‌রি কর্‌তে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল ; কিন্তু আমাকে ঠকিয়ো না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো ?

সেটা বিলক্ষণ জানি ; এবং কি করতে বল তুমি ?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুসী হইল ; হাসিমুখে বলিল, মেয়েমানুষে চিরকাল যা ব'লে থাকে আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে করে সংসারী হও—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যি খুসি হবে তাতে ?

সে মাথা নাড়িয়া, কানের দুল দুলাইয়া, সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ'বার। এতে আমি খুসী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি ?

বলিলাম, তা জানি নে ; কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে:বিয়ে না ক'রে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব ; কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করব, তা ব'লে দিচ্চি।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধকরি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসি মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল ; কহিল, বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ দুঃখ জানি নে রাজলক্ষ্মী ; যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্চি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয় ; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের

মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হ'ল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়ি নে।

তা হ'লে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জান্‌তেও চাই নে, বলিয়া সে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যে রহিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তার পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপের সম্মুখে, মেজের উপর সেই দুখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তার পরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলে-বেলা দেখেচি।

মার চিঠি পড়লে?

হাঁ, কিন্তু খুড়িমার চিঠিতে এমন কিছু লেখা নেই যে তোমাকেই তাকে ঘাড়ে কর্‌তে হবে; আর থাক্ ভাল, না থাক্ ভাল, এ মেয়ে আমি কোন মতেই ঘরে আন্‌ব না।

কি রকম মেয়ে ঘরে আন্‌তে চাও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখনি কি ক'রে বলব! বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রে থাকৃতে হ'লে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর এক জন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক্,

যথাসময়ে তাই না হয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই ; কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার ক'রে দিয়ো। শ-পাঁচেক টাকা হলেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়িমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না ; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বল্‌চি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয়, বলেই আমার আপত্তি, নইলে—

নইলে কি ?

নইলে আবার কি ! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার ক'রে তবে এ কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি নিজে কোন দিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে না হয় নাই পারব ; কিন্তু তুমি বর্ম্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে ?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম। কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে ?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস ! এ কি একটা শক্ত কথা ব'লে তুমি মনে কর ?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই সমস্ত বাড়ি-ঘর, জিনিস-পত্র বিষয়-আশয়—তার কি হবে ?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক্। তোমাকে চাকরী করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাক্‌তেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বন্ধুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অত দূরে না গেলেই কি নয়? এ সব তোমার কি কোন দিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না, কোন দিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি; কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এত বড় দুর্ব্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারি নে বটে, কিন্তু যখনি ডাক্‌বে, তখনি ফিরে আস্‌ব! যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাক্‌ব রাজলক্ষ্মী!

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাক্‌বে?

হাঁ, চিরদিন থাক্‌ব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোন দিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলক-চক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোন দিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুজনের চোখোচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুক-ফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।

২

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্য্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেম্‌নি। আজ আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযত, সে পরিচয় ছেলে-বেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারের বিদায়ের ক্ষণটিতে কোন মতে পলাইয়া সে আত্ম-রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সাম্‌নেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বল্‌চি

আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয়! একেও এর শাস্তি এক দিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এতবড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী জানেন! আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরওয়ান গাড়ীর কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয় ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষে দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরণ, তাতে—আচ্ছা যেখানেই থাকো সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা কর্‌ব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চল প্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপি চুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক্ গে, যেও না!

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ ও ঘড় ঘড় শব্দে অপরাহ্ণ-বেলা মুখরিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

৩

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোর-বেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লা-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে, এক খাঁকি-কুর্ত্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না আসা পর্য্যন্ত, আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়ীতে আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেঠি ও বড় রাস্তার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশুটে, গেরুয়া—একটু কুয়াসা করিয়াও ছিল—মনে হইল, এক পাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোট-ঘাট লইয়া, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারারাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেঠির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্য্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নিচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকেই পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার যায়গা করিয়া লইবার কথা; কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর

কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন্ আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে; সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনরশ লোক ইতিমধ্যে কখন্ ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকল বসেছিলে—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগদরি হোগা।

ডগদরি পদার্থ-টি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্ত মুখে কহিল, আরে, পিলেগকা ডগদরি।

জিনিসটা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল; কিন্তু বুঝি না বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই; কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলা-ঠেলি মারা-মারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দরজির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিতে বুঝাইয়া দিল যে, বর্ম্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে

পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি, কসাইখানার যাত্রীদের পর্য্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এত বড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ 'পিলেগকা ডগদরি' আসন্ন হইয়া উঠিল—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্ত্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না; তথাপি পূরোবর্ত্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্ব্বিকার চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা; কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সে দিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাই হোক্, পাশ করা যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন আর উপায় কি? যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিলাম, এবং পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা; কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণ ক্রিয়া যে কি ভাবে

নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কল কারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন সুমুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, মারহাট্টি, বাঙ্গালী, চীনা, খোট্টা, উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী শুদ্ধ মাত্র পরস্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণের বেগে ডাঙ্গা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নিচে পড়ে, ঠিক তেম্‌নি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল; আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নিচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এক কোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নিচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মত চক্ষের পলকে যে যাহার সম্বল বিছাইয়া বাক্স পেটরার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেছি; যদি বলেন, নিচে আনি।

বলিলাম, না; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্ধার করে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া, পা ফেলিতে পারি, এমন একটুখানি স্থানও

চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর এক দণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিস-পত্র দেখাইয়া দিয়া বক্‌শিস্ লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ব্যাপার—বিছানা পাতিবার যায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্টচিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে; কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটী। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙালী থাকে, ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নিচে নামিবার সেই গর্ত্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র এক প্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে; কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত সুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের

মধ্যে বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহা-সঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিত-কলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে, এতগুলা সঙ্গীত-বিশারদ এক সঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নিচে নামা উচিত কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে মুগ্ধ না হয়, সে খুন করিতে পারে, না এম্‌নি কি একটা কথা; কিন্তু মিনিট-খানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায় এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি, তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না, জানি না; না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল; হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি; হঠাৎ দেখি, এক ব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখ রাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগত-যৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়া ভুরু আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায় ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হইতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত-পাকের সোয়ামী বল্‌চেন, পরিবার!

খবরদার বল্‌চি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু এক দিনের তরে হেঁসেলে ঢুক্‌তে দিয়েচি! সে কথা কারও বল্‌বার যো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাত-জন্ম খোয়াবে না—তা জানো? এই বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্ব্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখ্‌লেন মশায়, দেখ্‌লেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখ্‌লেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতেই পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না; কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং সহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে? তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি

আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই। আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পর সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পর দিন সকাল-বেলা হইতেই শিষ্ট শান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্র-পীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলে-বেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি-করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নিচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশ তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রী-মশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নিচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুশুরি-খাঁসারি সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা

খবরদার বল্‌চি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু এক দিনের তরে হেঁসেলে ঢুক্‌তে দিয়েচি! সে কথা কারও বল্‌বার যো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাত-জন্ম খোয়াবে না—তা জানো? এই বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্ব্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখ্‌লেন মশায়, দেখ্‌লেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখ্‌লেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতেই পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না; কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং সহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে? তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি

আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই। আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পর সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পর দিন সকাল-বেলা হইতেই শিষ্ট শান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্র-পীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলে-বেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং বমি-করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নিচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশ তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রী-মশাই ?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই ! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল !

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড ?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন ? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নিচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুগুরি-খাঁসারি সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা

সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্ত্তিমান নোংরা একজোড়া কাব্‌লিয়ালা আপাদ-মস্তকে সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অত বড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল্‌?

পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হলে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত বল্‌চি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিস্‌ নে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই পুনরায় সেই হতভাগ্য কাব্‌লিকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বল্‌তে পারি নে। ওই দেখুন ভাঙা হাঁড়ি আর ওই দেখুন বিছানাময়

তার রস ; এর বেশি যদি কিছু জান্‌তে চান্ ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞেসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলাম, তা যাক্, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সে দিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাব্‌লি জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটীও অম্‌নি দিয়ে দেয়! ফেলিস্ নে টগর তুলে রাখ্, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র কর্কশ শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া, টগর চীৎকার করিয়া উঠিল— জাত তুলে কথা ক'য়ো না বল্‌চি মিস্তিরি—ভাল হবে না তা বলচি—

চীৎকার শব্দে, যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভাল মতেই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস নে—আমি তামাসা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার

বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার স্বর আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাসা! জাত তুলে আবার তামাসা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মাল্‌সা-ভোগ হবে? তোর কৈবর্ত্তর মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্‌ গে—বাপের পিণ্ডি দিস্‌!

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্‌!

টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্‌! বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদান করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্র-পীড়া ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবিরা ছি ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবশুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙ্গালী নর-নারীর দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরওয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাসা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন্‌ তো বহুৎ আচ্ছি লড়নেওয়ালী হায়! হট্‌তি নহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নিচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, সর্ত্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্র্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অপরের ব্যূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতা পুরুষ করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিক-চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলা-ফেরার মধ্যেও এক প্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ— যাহা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীরপো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্ত্তা, নিচে যাও; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট-পনের পরেই দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া, খালাসীরা হোল্ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার

নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরা-ধরি করিয়া নিচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পূরিয়া গর্ত্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক। আর ঝড়ে যদি জাহাজ মারাই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগর-দোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে; কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাঁহাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধা মত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখি-

লাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এ কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ত্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের যায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ্ যায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই; কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই ছাই-ক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলে-বেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোম্‌রা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া-গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া-

ছিল, এও যেন তেম্‌নি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এ দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল—রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌ বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্ব্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন

গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট ! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই ; কিন্তু এখনও তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না ; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট ; কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে। সেই অপরিমেয় গতি-শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর, কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল ; এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে !

আশে পাশে, উপরে নিম্নে চারিদিকেই কালো জল! জাহাজ-শুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে; কিন্তু মিনিট খানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-শুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্ত্তে পূরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নিচে হাঁস-মুরগীগুলা বার-কতক ঝট্ পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম; কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট্ ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক্, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথায় আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট্ বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি না ম্যা ম্যা করি, মা মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয় ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ; কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি বা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলা-ঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসের দোর-গোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্য দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোর-বেলা পর্য্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিস-পত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রীমশায় সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকাল-বেলা নিচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, মশায়, সাড়েবত্রিশ-ভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে যার কোটে ফিরে এসেছি। আজিকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশ-ভাজায় চলে কি না জানি না; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ লোক দিয়া ঠিক তেম্‌নি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিস-পত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই

লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটো প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্চে; বোধ করি একটা হ্যামক্ পেয়েছিলেন, না?

হ্যামক্ কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্চে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম যে, ডাক্তারবাবু অধমও এই নরক কুণ্ডেরই যাত্রী; কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই। সুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকী রাত্রিটা ফার্ষ্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এম্‌নি খুসী হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেক-চেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুর-বেলা, ক্ষুধার তাড়নে নির্জ্জীবের মত এই কেদারাটার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্য-বস্তুর চিন্তা করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জ্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙালী মেয়েলোক আপনাকে ডাকতেচে।

মেয়েলোক ? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহার অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে ; কিন্তু আমাকে কেন ? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোন দিন যে ইহার মামাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টা-খানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাক্‌তেচে—

কাতর ? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয় ? জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষমানুষটি কি কয়্‌চে ?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাক্‌তেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নিচে লইয়া গেল। অনেকদূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল ; তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেইশ বছরের বাঙালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটী অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি ; কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপ মারা দেখিতে পাইলাম, যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদাদিদির কপালও বড় ছিল—

অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথার সিন্দুর ডগ ডগ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা, আর কোন অলঙ্কার নাই, পরণে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙা-পেড়ে শাড়ী।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজ ভাবে কথা কহিলেন যে বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে, ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েছে। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল—কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাক্‌লে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, ইনি না হয় কষ্ট করে উপরে যাবেন। বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটীকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাক্তারকে ডাক্‌লে বোধ করি কিছু দিতে হয়; কিন্তু সে যাই হোক, এর হয়েছে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এঁর স্বামী; কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি জ্বর খুব বেশি, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নিচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্তবাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক্।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত।

বলিলাম, হাঁ।

বিস্‌কুট ?

তাও খাই।

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে ?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেছেন ?

বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হলে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা ; তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। যা হোক্, বেশি দিন টিক্‌চে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।

অবাক্ হইয়া বলিলাম, আপনি এ সব কি বল্‌চেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার ক'রে আন্‌চে, না ওকেই বার ক'রে এনেচে কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু ? খুব forward, না ? দিব্য কথাবার্ত্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম ধারণা আপনার মনে কি ক'রে এল ?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কি না, একটা না একটা আছেই ! গত বারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল।

একবার বর্ম্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্ম্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নিচে গেলাম। সপরিবারে মিস্ত্রীমশাই তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল ; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই ?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিতেছিল—ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি ?

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই মাগীর ছোট মন ? কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে—খবরটা নিতেও দোষ ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়ীটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই ছুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগরা বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্ত্রী মানুষ হ'য়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধূলো দেবে ? আরে, তুই ডাক্তার, না বদ্যি যে, যাই একটু জল আন্‌তে গেছি, অম্‌নি ছুটে দেখতে গেছিস ? কেন, কে ও ? ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি মিস্তরি ! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন !

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবো ? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আস্‌ব—তুই যা পারিস, তা করিস। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগর শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এম্‌নি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে একটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয়, অহর্নিশ সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখিতে হইবে, না হয়, যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে; কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে; আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজি আছেন।

এম্‌নিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রমপ্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে একটা পাকা জহুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্ব্বোধ হওয়াতেই যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশিই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নর-নারীর উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু

ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ি বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঔষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়-স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাস-খানেক পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করায়, অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণী-দাদাকে রাজী করিয়া বর্ম্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না ক'রে কোন মতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাক্‌লেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার খোঁজ নেন না, কিছু জানেন ?

না, কিছু জানি নে।

তার পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন ?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্ম্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন ; কিন্তু কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাই নি। অথচ একটা চিঠিও কোন দিন আমার ফিরে আসে নি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয় ; কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবতঃ হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মরমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেকে আছে, যাহারা সারাজীবনে আর কখনও দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নাই তাই কি আপনার মনে হয়।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন, এ কথা আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।

থপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাই নে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাব্‌ছেন, আমি জানি।

জানেন !

জানি নে ? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাব্‌তে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয় নি ? তা হোক্, আমি ভয় করি নে— আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব ?

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম ; কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাব্‌বেন, আমি ঘর করতে রাজী হলেই ত হ'ল না ; আমার সতীন রাজী হবে কি না, এই ত ?

বাস্তবিক, আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ, তাই যদি হয়, ত কি কর্‌বেন ?

এইবার অভয়ার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য কর্‌বেন শ্রীকান্তবাবু! আমার রোহিণীদাদা বড্ড সাদাসিধে ভালমানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাক্‌লে নিশ্চয়ই কর্‌ব ; কিন্তু এ সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে ; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতেই একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন্—কেরেন্টিন্। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine. তখন প্লেগের ভয়ে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সাবধান। সহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটা তারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে—ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্ব্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা সহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় সহরে থাকে, এবং সে

Port Health Officerএর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়-পত্র জোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি জোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না ; Quarantineএ নিয়ে যেয়ে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিষ নিজে কাঁধে ক'রে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে উঠাতে হয়—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয় ; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে ষ্টিমে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতীকার নেই ডাক্তারবাবু ?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাক্তারসাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জন্য ব'লে দেখব, তাঁর কেরাণীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজী—কিন্তু কথাটা তাঁহার ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার ৬।৭ জন খালাসীকে এলো-পাথাড়ি লাথি মারিতেছে ; এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটী অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজ কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার

অত্যন্ত গর্হিত—এক দিন তোমাকে এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন ?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এ ভাবে লাথি মারা ভারি অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া ক্যাটল সিধা হয় ?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেনসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, doctor, they are your countrymen ; you ought to be proud of them !

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দুহাতের বুড়া আঙ্গুল দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব্ব তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল! দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা দাঁত বার ক'রে হাসচিস যে!

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তার বাবু, ব্যাটা বলবার কে ? কারো কর্জ্জ ক'রে খায়ে হাসতেচি মোরা ?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantineএর কাছাকাছি একটা ছোট ষ্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তার-বাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ কতকটা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে সহরে গিয়েই নাম্‌ব।

অভয়া কহিল, না—না, শীগ্‌গির গুছিয়ে নিন্।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না, আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পার্‌বেন না।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও-যায়গায় যাব না।

ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টল্ টল্ করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে, এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন —এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারি নে। উঠুন নীচে চলুন। আপনি না থাক্‌লে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি করব বলুন ত?

নিজের জিনিস-পত্র লইয়া যখন ছোট ষ্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তার-বাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন—আপনার হুকুম হয়েছে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।

সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন।

তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।

না না, তার দরকার নেই, আমি জানিতাম। Good bye! চললুম! বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয়; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্ত্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন; কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সবাই কুলি ছিলাম। সাহেবেরা ইহাও জানেন যে কুলির জীবন যাত্রার সাজসরঞ্জাম এমন কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিস-পত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই! এ সকলই সত্য, তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপরে, এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোট-ঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দুরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারি বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিণীদাদা একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি—এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব—শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি

বাঁচেন! অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি, এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচ্‌কা-বুচ্‌কিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে! অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে; এক স্কন্ধে ভর করিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেম্‌নি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ। মোট-ঘাটগুলা ত সব ফাউ! এই সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা যায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া, পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে; হয় ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতে পারেন; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মন বলিতেছিল এত বড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে; কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না; তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙ্গিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে পড়িয়া গেল; কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেছেন—মনে কর্‌বেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যান নি, তার নাম দান। এত বড় দান কর্‌বার সুযোগ জীবনে হয় ত খুব কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি; কিন্তু সে কথা যাক্। জিনিস-পত্তর এইখানেই প'ড়ে থাক্, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণী-দাদাকে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিস-পত্র সেইখানেই পড়িয়া রহিল। অবশ্য সে সকল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা-দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ্ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে, অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেন্টিন। জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ বেশ forward হইতে পারে তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েছে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার, আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা দুটি শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি কর্‌বেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েচে? জিনিসগুলো আন্‌তে হবে, একটা ভাল ঘর যোগাড় ক'রে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরি ক'রে দিতে হবে, রান্না ক'রে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত

আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বস্‌তে পাবো ? না না, মাথা খান্‌, উঠবেন না ; আমি এক্ষুণি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে দিচ্চি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ-সব যোগাড় কর্‌ব কি ক'রে, না ? তা বৈকি ! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে ! সে আমি না আর কেউ ? বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাশী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে ! মেমসাহেব ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিস-পত্র আসিয়া পৌছিয়াছে,দুখানি খাটিয়ার উপর দুজনের বিছানা পর্য্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। এক ধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা, কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজি ডাক্তারের সহিত অভয়া ভাঙ্গা হিন্দিতে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দুঘটি জল ঢেলে নিয়ে এ-বেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ও-বেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া, একজন খালাসিকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতায় এখানের দিন-গুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটা জিনিষ শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায় ; কিন্তু ইহা সে কোন দিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, তাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া

দিত, আমরা এক-যায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই—দুদিন পরে হয় ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখনও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ ত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদাদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এ দুঃখ।

হয় ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘণ্টায় দুটা বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনাদের চা তৈরি ক'রে আনি—দুটো বাজল।

মনে মনে বলিতাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

তার পর একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর একবার পোঁটলা-পুটুলি বাঁধিয়া রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, সহরের মোসাফিরখানায় দুই-এক দিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের যায়গায় যাইব, এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

সহরে যে দিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্রহ্মবাসীদের কি একটা পর্ব্বদিন। আর পর্ব্বও তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোষাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ-উৎসবে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব্ব পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, হাসিয়া গল্প করিয়া, গান গাহিয়া সমস্ত পথটা

মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রঙ অধিকাংশই খুব ফর্সা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বুই জন রমণীর হাঁটুর নিচে পড়ে। খোঁপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা—ঘোম্‌টার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পালাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন—যেন ঝরণার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে! প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এই নইলে আবার জীবন! তাহাদের সৌভাগ্যটা সহসা যেন ঈর্ষার মত বুকে বাজিল। কহিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দ্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। বচসা বাধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া লইয়া। গাড়োয়ান আমাদেরই হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা; আর তিন জন ভদ্রবরের ব্রহ্মরমণী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—না, পাঁচ আনা; মিনিট দুই-তিন তর্কাতর্কির পরেই, বলং বলং বাহুবলং! পথের ধারে একটা লোক মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড খাদি করিয়া বিক্রী করিতেছিল, অকস্মাৎ তিন জনেই ছুটিয়া গিয়া তিন গাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত

তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু তামাসা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগ্‌ড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

সবে বাঙলা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই; কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান মদ্দ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠি-পেটা করিতে পারে—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘর-কন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না; কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং শুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙালী বর্ম্মা মুল্লুকে পদার্পণ করামাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্ম্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরী-তরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে

চলিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব'লে দিতে পারেন ?

লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজচেন ?

বলিলাম, সে ত জানি নে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি। শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, ওঃ—মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত দেখতে পাই নে! তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাক্‌লে কি উড়ো চিঠির কর্ম্ম ? কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে, কি জানেন মশাই—

দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন যায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হ'লে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানি নে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরী বললেন? আসছেন কোত্থেকে? বাঙলা থেকে? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজচেন।

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিন্‌ব কি ক'রে? আসুন আমার সঙ্গে! বরাতে ক'রে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগ্‌ড়ি নাকি আবার একটা মিস্তিরী! মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে আপনাকে চাক্‌রি ক'রে? তা সাহেবকে ব'লে দিতেও পারে একটা জোগাড় ক'রে, কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা হ'লে আঠারো আনা পাঁচ সিকে রোজ ধর্‌তেও পারে। এর বেশি নয়।

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারীতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় জোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই, ভদ্র-লোক, কেন ভদ্রলোকদের মেসে যান না?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না।

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল; কিন্তু ওবেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এই বেলায় নন্দর সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমোচ্চে। ডাকাডাকি ক'রে তার ঘুম ভাঙালে রক্ষে থাকবে না মশাই।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মাঝে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দাঠাকুরের হোটেল রয়েচে—চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়্‌লে তখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদর সহিত গল্প করিতে করিতে দাঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিঙ্‌ রুমে জন-পনের লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজীতে দুটো কথা আছে instinct এবং prejudice; কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়; কিন্তু আমাদের এই জাতি-ভেদ, খাওয়া-ছোঁয়া বস্তুটা যে

instinct হিসাবে সংস্কার নয়, তাহা দাঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ টের পাইলাম; এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে এই যে অসংখ্য জাতি-ভেদের শৃঙ্খল—তাহা দুপায়ে পরিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক্; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমনি দেশে পা দেওয়া মাত্রেই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ছাপ্পান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সে ও একই কথা—না খেলেও, সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্ম্মা ত তিন-চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙালী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাহ্মণই বেশি হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক-ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে; কিন্তু তাহারা যে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্চায্যিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ

করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা রুটি, ফলটা পাকড়টাও ছাড়েন না। অথচ সেই একদম্ নিষিদ্ধমাংস হইতে বর্ত্তমানে রম্ভা পর্য্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদা-গাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আরাম এইটুকু যে, বর্ম্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোডিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয় ত আবার একটা ছোট-খাটো ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। হোটেলে যাহারা সারি সারি পংক্তি-ভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর—ওয়ার্ক-শপে কাজ করে। সাড়ে দশটার ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। সহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্ম্মী আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দাঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকরি-বাকরি হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেনো না, একমাস থেকে এবং খেয়ে দাম না দিয়েও ত চলে যেতে পারি ?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই ?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন! বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপে অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতে নাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকা-কড়ি, আংটি ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্ম্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক্, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া খাবার যায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিঙ্-রুমে বহুলোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকে সেখানে না দিয়ে এখানে দিতেছ কেন ?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা, বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি ?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্ক-মেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে ত এখনো ঠিক হয় নি। যাই হোক্, আজ দিচ্চ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো।

ঝি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন ?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙালী বটে, কিন্তু একজন ডোম আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই ?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত; কায়েত আছে, কৈবর্ত্ত আছে, সদ্‌গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না ?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাত সমুদ্দুর পারে এসে কি অত বাম্‌নাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্তান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।

হয় ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চল্‌তি-মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্তানটা হয় ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আব্‌হাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি ব্রাহ্মণের অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণ নয়, তাহাদের। আহারাদির পরে কৈবর্ত্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্ম্মকারমশায় স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্ম্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না ?

কর্ম্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বই কি।

তবে ?

ও কি আর প্রথমে ডোম বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল ; বলেছিল, কৈবর্ত্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বল্‌লে না ?

কি আর বল্‌ব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে ত বল্‌তেই হবে। তবে লজ্জা পাবে, এই জন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হলে কি হ'ত ?

লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল ? তার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরি নে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে আর সবাই সমান; নব-শাখই বলুন, আর হাড়ি-ডোমই বলুন, কিছুই কারও গায়ে লেখা থাকে না ; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটচে। আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয় মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার-ব্যবহারে কার সাধ্যি বলে, ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে ; আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা ? ব্যাটা দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। আমরা সবাই না থাক্‌লে এত দিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হ'ত যে !

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না ; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে দেশে ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত চর লাগাইয়া তাহার আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন

অপরিচিত বাঙালীর এত বড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে ; এবং শুধু তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে কথা উত্থাপন পর্য্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যাক্। বহুদিন পর্য্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি; কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে, এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজী জানি, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজী-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুদ্ধ এই জন্যই আমার কত সৎ-সঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই; কিন্তু সে কথাও আজ থাক। দেখিলাম বাঙালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া

একেবারে খাঁটি গৃহস্থ পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয় ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙালী, অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান, বর্ম্মী নই, বাঙালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে; শুধু বাঙালী হইলেই যথেষ্ট, এবং চট্টগ্রামী বাঙালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যস্। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা ভালবাসে না; আবার একটা ঘর সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারাও বলে, আমরা বাঙালী। আবার তাহাদের বিবাহে সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর এক তিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থ-ই হিন্দু, এবং দুর্গা-পূজা হইতে সুরু করিয়া ষষ্ঠী-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

৭।

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল সহরের এক-প্রান্তে আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনর-ষোল দিনের মধ্যে ও-দিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকুরির উমেদারীতে ঘুরিতে ঘুরিতে এম্নি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও

বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাক্‌রি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেম্‌নি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাঙ্‌লা দেশের আব্‌হাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাক্‌রি করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কোনমতে হাড় মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীবাবুরও যে সে ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাক্‌রি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবা-গোবা-বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্য্যন্ত যেন ভয় করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক্‌, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্ণ-বেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধর-মণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরু-গম্ভীর; কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত?

বলিলাম, আজ্ঞে, হাঁ।

যান, ভিতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত?

হুঁ—ভেতরে যান্ না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন?

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার যো হয়েচি—দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদাদার মধ্যেও যে এতখানি গাম্ভীর্য্য এতদিন প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরূহ; কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসি মুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ-সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, দুদিন পরেই জান্‌তে পার্‌বেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহ্বানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই

চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও এক গ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্ব্বাহ্ণেই করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং? এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলেই তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এত দিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না, আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকুরির জোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। রোহিণীবাবু যে বল্‌ছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটীতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পট্ পট্ শব্দে ঘরে ঢুকিয়া কাহারও প্রতি দৃক-পাত মাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া, এক নিশ্বাসে অর্দ্ধেকটা এবং বাকিটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গ্লাসটা কাঠের মেজের উপর ঠকাস্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক্, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে, ক্ষিদে পেলে খেতে দেবে!

আমি অবাক্ হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া

সে সহাস্যে কহিল, ক্ষিদে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে কথা কানেও তুলিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অর্দ্ধ মিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সারাদিন আফিসে খেটে খেটে ক্ষিদেয় গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারি নি—কিছু মনে কর্‌বেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারেন?

তাহার মুখের ভঙ্গীতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, কিন্তু সেখানে লুচি-মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?

আমি জিজ্ঞাসু মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই, সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধরে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি কর্‌তে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শান্ত ভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বই কি!

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হ'তে পারে; কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ কর্‌বেন কেন? আমার মাথা ধর্‌লে তাঁর কাজ চলে কি ক'রে?

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—এ কথা আমি বলেচি?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্ছি! ওঃ—তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে?

অভয়া কহিল, তোমাকে ব'লে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন। ওঁর জন্যে আমি দেশ-ত্যাগী হলুম—বাড়ি ফের্‌বার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও—আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন, শ্রীকান্তবাবু, দুটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—বলিতে বলিতেই তাঁহার কান্নায় কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত চোখেই দেখিলাম; কিন্তু ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও, সে যে ক্ষুণ্ণ এবং খাবার তৈরির ত্রুটি হইতে বহু দূর দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশ মাত্র বিলম্ব ঘটিল না! তবে কি স্বামী-অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেই কেমন যেন

সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—এখন তা হলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আস্‌বেন?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বল্‌তে চাই নে। বলিয়া আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দায় সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণীদাদাকে আশে পাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্য্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চায়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা, কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্ব্বেকার ঠিকানা দিয়া নিচে লিখিয়াছে—আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা বাহিরের

লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়; কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতেও তাহাকে বারম্বার চোখেই দেখিয়াছি—কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিম্বা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্য্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না—কথায়-বার্ত্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা আফিসে চাক্‌রি জোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটি যেই হোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারীতে লাগিয়া গেলাম; কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দাঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে

সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু চাকুরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না ; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিককাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকন্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম ; কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাইবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণীকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরি-তরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামা-কাপড়-জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ সীমায় পৌছিয়াছে—তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতি পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিয়াছেন ; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আজ আমার চক্ষে পড়িয়া গেল। এই সব কেনা-কাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌছিতেছে, এ যেন আমি সূর্য্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই সকল লইয়া তাহার বাড়ি পৌছানো একান্তই চাই, কেন যে এই সকলের মূল্য দিবার জন্য চাকরি তাহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং আমি পাই নাই।

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া শত ছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া

আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামা-কাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে। আর আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সঙ্কোচে জড়-সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি!

রোহিণীদা চলিয়া গেলেন—আমি তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না; এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দুচক্ষু ঝাপ্সা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনেই বার বার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এতবড় শক্তি, এতবড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এতবড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ-সংস্কার আমার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি সাহেব হইবেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও, দেখিলাম বেশ বাঙ্‌লা জানেন। কারণ কলিকাতার আফিস হইতে তিনি বদ্‌লি হইয়া বর্ম্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াইগুণ বেশি পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে একলক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া হাড় বাহির করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ-বনাত-মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এম্‌নি করিয়াই হয়। আমাদের হোটেলের দাঠাকুর নেহাৎ মিথ্যা বলেন না।

গাড়ী-ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদা আফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন; কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক, আমার ত ছিল না। অতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, তোমাকে বার বার বল্‌চি রোহিণীদা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম ক'রো না, তুমি কি কিছুতেই শুন্‌বে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকার? দিন ত বেশ চলে যাচ্চে।

রোহিণীর দুচক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এঁর অন্যায়! সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্য্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি এত বলি, কিছুতে শুনবেন না। দুটি লোকের রান্নার আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি

দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না—আমার বিধাতা-পুরুষেরও ছিল কি না সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল বর্ম্মা রেল কোম্পানীর আফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানীর চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্ত্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা। আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কি না; তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি; কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন ?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ওমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন ?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জান্‌ব বলুন ? তা ছাড়া, তিনি নিজেই বা জান্‌বেন কি ক'রে ? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল, একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিন্দু দায়ী নন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে ?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থ-ই অকূল পাথারে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছিল না সত্য, কিন্তু নারীর এত রকমের উল্টাপাল্টা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে, বাহির হইতে এই দুটো চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যয় করা কত বড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্ত্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল ; কিন্তু দশ হাত না যাইতেই মনে পড়িল, ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ি

থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ি ঢুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না—তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্ব্বাক্ সাক্ষী এ জগতে বিদ্যমান রহিল

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা, আসিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল; কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না; তার পরে, লিখিবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারি হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এম্‌নি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্য-চর্চ্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকাল-বেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্র নারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল; কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সঙ্কটের কালে যে-রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্ম্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রশ্নটা উল্টা দিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ পাওয়ার সমস্যাই বার বার মনে উঠিয়াছে; কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা

একটিবারও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরুষ আমার উপরেই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন-চার পাঁচ পরে আমার একজন বর্ম্মা কেরাণী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরের নীল পেন্সিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট-কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরাণীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ-চুরির অভিযোগে সসপেণ্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরাণীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী; ইঁহারও চার-পাঁচ-পাতা-জোড়া কৈফিয়ৎ ছিল। বর্ম্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরাণীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে! ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরে ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরণে হ্যাট-কোট—কিন্তু যেমন পুরানো, তেমনি নোঙরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নিচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড় ইঞ্চি পুরু! তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে-বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল ; সবই জানি ; কিন্তু এই মূর্ত্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক্, সে সুশ্রী এবং সে মার্জ্জিত-রুচি ভদ্রমহিলা ; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্ম্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা যে দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট-দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দ্দোষ ; তবে সে থাকায় ট্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া এক-জন আপনার লোক ভর্ত্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। এক বিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি? আপনার মত কর্ম্মদক্ষ লোকের বর্ম্মা মুলুকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে বসে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বল্‌চেন, তা নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারি নে ; কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলিম্যান, অনেক গুলি কাচ্চা-বাচ্চা—

আপনি কি বর্ম্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন নাকি।

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ। বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বল্‌চেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা কর্‌ব, তা বোল্ডলি স্বীকার কর্‌ব। আমার অমন ভেতরে এক বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝলেন না? যা বল্‌ব, তা স্পষ্ট বল্‌ব মশাই, আমার ঢাক্‌ ঢাক্‌ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এইখানেই যখন চিরকাল চাকরি করে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই? আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্লান-মুখে কহিল, আজ্ঞে না, কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সূর্যিমামার দেশে আস্‌তে পারতাম? মশাই, বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমরাও একটা জমিদার! এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিক্‌রে যাবে; কিন্তু অল্প-বয়সে সবাই মরে হেজে গেল—বললাম, দূর হোক গে; বিষয়-আশয় ঘর-বাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্ঠীদের বিলিয়ে দিয়ে বর্ম্মায় চ'লে এলাম?

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিল, ওঃ—তাই বলুন। তা স্বীকার করচি, এক সময়ে সে আমার স্ত্রী ছিল—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ? লোকটা বিমর্ষতার ভাণ করিয়া বলিল, কি

জানেন, ফ্যামিলিসিক্রেট বলা উচিত নয়; কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বল্‌তে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হ'লাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনি বলুন না—এ কি সোজা মনের ঘেন্না!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না; কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তাঁর এই অপরাধের কথা আপনি আস্‌বার সময় ত ব'লে আসেন নি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠি-পত্র এবং টাকা কড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখন ত লিখে জানান নি?

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূল ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এই নিন্‌ কথা। জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্র-লোক, শুধু চুপি চুপি সহ্য কর্‌তেই পারি—ছোটলোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক-পিটে প্রচার করতে পারি নি। থাক গে, সে সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই—এ সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আন্‌লেও পাপ হয়। তা হলে কেসটা ত আপনি ডিসপোজ করবেন? যাক্‌, বাঁচা গেল; কিন্তু তাও ব'লে রাখচি, সাহেব ব্যাটাকে অম্‌নি অম্‌নি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছুনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বলিলাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, নিন্, তামাসা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এসেছি ভাবেন? তা মরুক গে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা, বড়সাহেবের অর্ডারটা আজই বার করে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? নটার গাড়ীতেই চলে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হ'তো না; কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ, খোসামোদ জিনিসটা এম্‌নি যে, সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া, বুঝিয়াও—ক্ষুণ্ণ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উল্টা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড়সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাক্‌রির চেষ্টা দেখ্‌বেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্ করবার নোটিস আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙালী হয়ে বাঙালীকে মার্‌বেন না বাবু; ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখ্‌বার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানি নে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলা পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরাণী, দরওয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক্ হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্ম্মায় এসেছে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলি নে; কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে—তার কাছ থেকে চিঠি আন্‌তে পারেন—আপনার চাক্‌রি আমি বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ব। না হলে আর আমার সঙ্গে দেখা করে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলি নে।

এই নীচ-প্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয়, তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এম্‌নি সময়ে আস্‌বেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা-বেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ কর্‌তে পার্‌বে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্ম্মা মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ; তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বার বার আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন ?

কথাটা শুনিয়া খুসি হইব, কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না ; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাই পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন দিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জানি না—একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া সে বেশি কথা না কহিয়া, শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল ; কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার এক ছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার কর্‌লেন, তা মুখে বলে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হয়ে থাক্‌ব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গে, বড়সাহেব এবার মাপ করেছেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড়সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবি নি,

শুধু আপনি ক্ষমা কর্‌লেই আমি বর্ত্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি ; এই বলিয়া আবার সে বলিতে সুরু করিয়া দিল—তেম্‌নি নির্জ্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য ; এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। এত কথা শুনিবার ধৈর্য্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল ; না হইলে, অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে? এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না শুধু বর্ম্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে) ; কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলে-পুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী-ছাঁদ, তেম্‌নি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পর্‌তে দেবে, না, মর্‌লে এক-গণ্ডুষ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, বিলক্ষণ! যত দিন চোখে দেখি নি, ততদিন কোনরকমে না হয় ছিলাম ; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল কর্‌তে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেচে। একবার ভেবে দেখুন দেখি ব্যাপারটা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি এক সঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে না, এখন গ্রামের পোষ্টমাষ্টার মশায়ের ওখানেই রাখ্‌ব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাক্‌বে; কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক করে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিল, আমিও আবার দিনের কাজে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নিচেই অভয়ার সেই লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল। তার পরে কতবার যে সেই দুছত্র পড়িয়াছি, এবং আরো কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজ-পত্র কিছু দিয়ে আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন্ সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেছে, এবং কেরাণীর দল দিনের কর্ম্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ি প্রস্থান করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরম কল্যাণীয়—

শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—

৯

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ব্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে সঙ্কটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া, আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে! ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে; এবং তাহার একদিকে তাহার বর্ম্মা-স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যহ সাধ্যসাধনা করিতেছে; কিন্তু কোন মতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্ম্মিণীর এবম্প্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু কলিকালের ফল, এবং সত্যযুগে যে এরূপ ঘটিত না—বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত সমেত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, হায়! সে আর্য্য-ললনা কৈ! সে সীতা-সাবিত্রী কোথায়? যে আর্য্য-নারী স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বামী-সহ অক্ষয় স্বর্গ-লাভ করিতেন, তাঁহারা কোথায়? যে হিন্দুর-মহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামী-দেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী। কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ। আর কি আমরা সে সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা জোড়া বিলাপ; কিন্তু অভয়া পতি-দেবতাকে এই পর্য্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস

করিতেছে তাই নয়; সে আজ পরম-বন্ধু পোষ্টমাষ্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে কে একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্য্যন্ত যে ইজ্জত নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানানো অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক্, না বুঝিয়া হোক্ আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায়, তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলে-মেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন বর্ম্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্য্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্ব্বেই গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্ব্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অপটু, কত অসহায়—এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্ম্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরল-চিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না।

নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ সতীধর্ম্মের একটা অপূর্ব্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সেই যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি, সবাই অন্নদাদিদি নয়; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অতবড় বুকও সকল নারীতে থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকার মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীকে বেশ করিয়া যে দুকথা শুনাইয়া আসিব, তাহারই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে, কি হয় নাই; অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা ভাদরও নয়—কিন্তু শূন্য মন্দিরের

চেহারা যদি কিছু থাকে ত, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এ ছাড়া আর কি, সে ত আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডানদিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়াছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি; কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়ার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু? ওঃ—, বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল, এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনেই চুপচাপ! আমিই প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে? চলুন আমার সঙ্গে!

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্ছে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি !

তা বটে ! কিন্তু এ সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই না তিরস্কার করিব, কতই না সৎপরামর্শ দিব ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম ; সব ভাসিয়া গেল। এতবড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতি-শাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশী পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ ! সমস্ত সাধু-সঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না।

রোহিণী কহিল যে, সে প্রাইভেট টিউশানিটা ছাড়িয়া দিয়াছে ; কারণ তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি !

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আর নিজের জন্যে ভাত রাঁধা বাড়া, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে এসে ভারি বিরক্তিকর। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু ?

বলিব আর কি ! আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ ত জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। কল্পনার ত কেহ সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না, স্নতরাং সে কথা ধরি না ; কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোন ভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না যে, হতভাগ্যের গৃহের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা, যদি খাড়া রাখিতে না পারে,

ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল, ভদ্দরলোক।

তাই আমার ঘরে।

আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোটভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই, গল্পে শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের ভেড়া করে ধরে রাখত! কি জানি, সে-কালে তারা কি করত; কিন্তু এ কালে বর্ম্মা-মেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে এক তিল কম নয়, সে আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোটভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোটভাইয়ের বর্ম্মা-শ্বশুর-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড়ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোটভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেলে করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোটবোন লইয়া এবং জন-দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্ম্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া, সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরি-

শ্রমী ; কিন্তু পুরুষেরা তেম্‌নি অলস ; ঘরের কাজ-কর্ম্ম হইতে সুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয় ; কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্ম্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্ন বাড়িতে ধ্বংস করিয়া, বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি ছি করিয়া, ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিয়া, অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে!

মিনিট-দশেকের মধ্যেই বাবুসাহেব দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ইংরাজি পোষাক, হাতে দু-তিনটা আঙটী, ঘড়ি চেন—কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার বর্ম্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোটবোন চুরুট, দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে। লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু টারু এম্‌নি কি একটা যেন হইবে। যাক্ গে আমরা না হয় তাঁহাকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে?

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ত কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যান নি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন, ইত্যাদি

সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের দর্শনাভিলাষে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল ; এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা বলিয়া ডাক দিয়া যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিস্ ফিস্ মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্ণে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ি যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল ; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত ?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম ব'লে একবার জাহাজে চড়্‌তে পারলে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন ?

দাদা কহিলেন, বাপ রে! তা হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে! বেটীর যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধর্‌বে। বলিয়া চোখ দুটো মিট্ মিট্ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ফ্রেঞ্চ লিভ মশাই, ফ্রেঞ্চ লিভ—এ আর বুঝ্‌লেন না ?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারি কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোন মতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার! বর্ম্মা-বেটীদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটো-কাঁটার বিচার, না আছে একটা জাত-জন্ম। বেটীরা সব নেপ্পী (একপ্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙপি' বলে) খায়, মশাই নেপ্পী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়। এ ব্যাটা বেটীদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাক্‌ড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ'রে রাজার হালে খাওয়াচ্চে, পরাচ্চে, আর কিছু না হোক, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অবাক্ কর্‌লেন মশাই! পুরুষ-বাচ্চা, বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা সখ করেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন। আমার জান্‌তে বাকি নেই, এর না হয় একটু জানাজানি হয়েই পড়েচে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এম্‌নি করেই বেড়াতে হবে? ভাল হয়ে সংসারধর্ম্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হ'তে হবেনা? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে মুরগী পর্য্যন্ত খেয়ে আসে; কিন্তু বয়স পাক্‌লে কি আর তাই করে, না, কর্‌লে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বল্‌চি, না, মিথ্যে বল্‌চি!

বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। আফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু আফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখ্‌লাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি—বলে যাওয়াই ভাল। এ বেটীরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জাসরম, না আছে একটা ধর্ম্ম-জ্ঞান! জানোয়ার বল্‌লেই ত চলে!

বলিলাম, হাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যই ছিল; কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। আফিস বন্ধ, সকাল-বেলাটায় করিই বা কি; তাই তাঁকে see off করতে জাহাজ ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে ওদিকে চাহিতেই সেই বর্ম্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোটবোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙা। ছোটবাবু মহা ব্যস্ত! তাঁহার দুচাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ্গ বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়-ধাপ করিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার মুহূর্ত্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিস-পত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্য-সম্ভারের হেফাজত করিয়া, যায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্ম্মা-স্ত্রীর কাছে

বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময়ে ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে! সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী। সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি! তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘকাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে! তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত অমৃত সে ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এতবড় নির্দ্দয় বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল। লোকটা একহাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্ম্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহ বা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্ম্মা ভাষায় এবং বাঙলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙলাটা কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়,—একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আনিব, তা আমিই জানি! ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম!

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙ্গালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই ; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ টাকা তামাক কিন্‌তে দিলি—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভর্‌ল না—অমনি তোর বাড়িটাও বিক্রী করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পার্‌তাম, তবে ত বুঝ্‌তাম, একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশ-পাশের লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল ; কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভরে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা!

খালাসিরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু, সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুণির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন ক'রে হোক দুশ-আড়াইশ টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। যথা লাভ! বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু

এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব ; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বিধাতারও নাই !

১১১ - ১১৪
১১৮ পাতার পর দেখুন

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সাম্‌লাতে পারি নি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা ব'লে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে বাবু বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জান্‌তে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধ, কঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্ম্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে স্ত্রী হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এত দূরে এসে তাঁর শান্তি ভঙ্গ করেচি

—মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্দ্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানি নে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন —দেশে খেতে পর্‌তে দেয়, এমন কেউ নেই; তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাই নে।

তিনি একখানা বেত তুলে নিয়ে বল্‌লেন, আজ তার জবাব দিচ্চি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আর একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্ব্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু যে অন্ধ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং, বেশ করিয়াছ, একথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ, এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায় এ কথা আমি বলতে পারি নে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিন্তুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্ম্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছি নে; কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধ মাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার ক'রে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জান্‌তে চাইচি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্ত্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা! তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন; কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা, আমার অন্যায় হয় নি, কিন্তু—এই কিন্তুটার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে, তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারেই মিথ্যা? এতবড় অন্যায়, এতবড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নাই, আমার মা হবার অধিকার নাই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাচারী, কদাচারী স্বামী বিনা-দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাতে, সব ধর্ম্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ বা বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই কর্‌লে! হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল, এম্‌নি কত কি মন্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তামাসার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোটবোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী এসেছেন, দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, বাবুজী, বাড়ী আমার আজ খালি হইয়া গেছে। কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকিব। এক মাসের জন্য তামাক কিনিতে গেলেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জানি কত কষ্টই হইবে, কেন আমি যাইতে দিলাম। রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া এতদিন আমাদের চলিতে-ছিল—কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠাইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব। এম্‌নি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু থামিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতেছিলাম, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ীর দরজা আট্‌কাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ী চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কতদূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন যায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, মিলে বৈ কি।

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোটভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্য বশতঃই হোক বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক্, বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এত বড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে ত

মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন ? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য ?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটী তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলযোগ যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্ম্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে কোন নর-নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার বাবুটীর দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতেও পারে না। হিন্দু-সমাজ তাহাদের গ্রহণ না করে, নাই করিল, কিন্তু আপামর সাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারাজীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করা, না হয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম্ম কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক—এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই সকল কথা না হয় সময় মত চিন্তা করিয়া দেখিব ; কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনাদোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া, তাহাদের মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া

পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটী, বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব আইয়ে!

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্য্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার-দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমিষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল; কিন্তু লজ্জার যে মূর্ত্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দুরকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্ম্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এ সব অভ্যাসমত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হ'বে, কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চ'লে যাচ্ছিলুম; কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হয়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্ম্মামেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বল্‌তে পারি নে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদাদিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদাদিদির সমস্ত কথা আগা-গোড়া বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানি নে! এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি বলেই তুলনা দিতে পারলুম। তার পরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা

হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী ; কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরে নি, পিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্যে অমর হয়ে ছিল, সেই দিন তার প্রমাণ হয়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে ?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন এক দিন এসে পড়ল, যে দিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হ'ল জানেন ?

জানি। তার পরে আর নেই।

অভয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বল্‌তে চান যে আমি একা নই—এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বল্‌তে চাই নে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না ; গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বল্‌তে পারেন ?

না, তাও পারি নে ; তা ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে যে, এই সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর এক দিন ভেবে দেখ্‌ব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখ্‌তে পেয়েচি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই কর্‌তে পার্‌তেন

না, এ আমি শপথ করেই বল্‌তে পারি। সে ভার অসহ্য হলেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাব্‌লেও হয় ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেছি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকিয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম, তা না হলে সে এত সহজে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখ্‌তেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার যো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাইরে একটা সম্বন্ধ আছে, আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েছে বলে আমাকেও এখন আর তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাই নি। তার থেকে এই বুঝেচি, দুঃখ জিনিসটা অভাবও নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝেচি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন; কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েছি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল,

এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক্ দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে-পুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আর আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিন্‌তে চাই নে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণদুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসী হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার

মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয় ত কিছুই থাকবে না ; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতেই চল্‌বে না। না হলে তারা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নিই বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখেই উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব ; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে ; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল ; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয় ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন ; কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজ-কর্ম্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্ম্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?

ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পার্বেন না, সে আশ্রয় আপনাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়বে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা যায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্য হয়, তা হ'লে কি তারা অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠ্‌চে, আর আপনারা ন্যায়-ধর্ম্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বল্‌তে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্চে। শুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করে নি, যেখানে একটা মস্‌জিদও তৈরি হয় নি। আমরা হয় ত চোখে দেখে যেতে পাবো না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আস্‌বে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্ম্মা দেশটাও একটা মুসলমান প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজ-ঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত কোন মুসলমান বড়ভাইয়েরই কি ধর্ম্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার

ক'রে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্য্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম্ম বজায় থাক্‌তো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জান্‌লেন কি ক'রে? আমার মনে হয় না, এত বড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা ব'লে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারব না।

অভয়া ম্লান-মুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হ'লে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক্ দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকে যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসেবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

মনোহর চক্রবর্ত্তী বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দাদাঠাকুরের হোটেলে একটা হরি-সংকীর্ত্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন; কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিতাম না। এইমাত্র শুনিলাম—তাঁর নাকি অনেক টাকা এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প, জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান ত আপনাকে এমন গুটি-কয়েক সৎপরামর্শ দিতে পারি, যার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যার কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন, শুনলে হয় ত অবাক্ হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পেতেন; কিন্তু মরবার সময় বাড়ি-ঘর পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, এ কি সোজা কথা! আপনার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনা-পত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল—বর্ম্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করছেন বলুন দেখি! ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান, আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু আমার কথামত, বেশি নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি; আমি বলচি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্য্যন্ত করতে পারবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্ম অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ সত্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, জানি না ; তবে কি না, তিনি ভিতরে ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজ-মন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটী খুঁড়লে একটা পয়সা মেলে না! সে কথা বলি না ; নিজের মুখে রক্ত-উঠা-কড়ি—আজ-কালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলে-পুলে, পরিবারের জন্ম রেখে-থুয়ে তবে ত? সে কথা ছেড়েই দিন তা নয় ; কিন্তু দেখুন, যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দেবেন না। বেশি নয় দু-চার দিন আসা যাওয়া করেই নিজে হতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের ঝগড়া ঘরে টেনে আনা। দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যই কেউ ছাড়তে পারে না—তাগাদা করতেই হয়। তখন হাঁটা-হাঁটি ঝগড়া-ঝাঁটি—কেন, আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যিই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্র সন্তান, তাই কথাটা চট করে বুঝলেন ; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা বেটারা সাত-জন্মেও বুঝবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কৰ্জ্জ করে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এই ছোটলোক ব্যাটারা এম্‌নি আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা

ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট ত তুভরি সোনা এনে রেখে যাও ত, দিচ্চি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বলিলেন, ঠিক নয় আবার! একশ বার ঠিক! আর দেখুন ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয় ত তু-একঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া, এক পক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটাছুটি আদালতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে, তুটো ভাল মন্দ পরামর্শ দাও—পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তখ্‌খনি বলে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে তুটাকা দিয়ে সাহায্য কর; মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। না হয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমার কিছু একটা—মা শীতলা না করুন, এই নাক কান মল্‌চি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের তুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের? তারা কখ্‌খনো অমন স্থানে যায় কি? কখ্‌খনো না।

নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে বস্। হয়ে গেল! তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি! তার পরে ভাল হলে আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমনি। মশাই কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

আফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই; এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ, তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে জীবন-যাত্রার কার্য্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিসের সি-আই-ডির লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইঁহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন।

সেই অবধি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলা মিলাইয়া লইয়া আগাগোড়া জিনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেই দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের

সংস্কার কিছুতেই সে দিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়া বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্ত্তেও —যাহার সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না। আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্ত্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন, —সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা তখন মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত বাবু, দুঃখ ভোগ করবার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষে বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে এক দিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর এক দিকে তত বড় সুখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছি মনে করিয়া, নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্দ্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার

দুঃখভোগের কঠোরতা দেখিয়া, দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের প্রতি ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে এবং ওই পা উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক্ কতকগুলা দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল যে, বিধবার আচরণ বলুন—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দু-বিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চাল-চলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায় তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চাল-চলনটাই সে জন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় তাই। তাদের আচরণ-টাকে ব্রহ্মচর্য্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশ সকল যুগে বিধবার চাল-চলনটাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে। ইহাই নিরর্থক

ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পশু করিয়া দিবার এতবড় ছায়াবাজি আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারি forward কিন্তু তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্য্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা-কাটা-কাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত এক রকম—কাজ আর এক রকম ছিল না বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না—কেমন এক রকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক্, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, এ কথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এম্‌নি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতেছিল বলিয়া,

না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এম্‌নি সময় হঠাৎ একদিন সহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্র পারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটী মন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই এক মুহূর্ত্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ সহরের চৌদ্দ-আনা লোকই হয় চাকরীজীবী, না হয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও যো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পাঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পলায়; আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। ইঁদুর বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই লোকে ছুটিতে সুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আব্‌হাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে—কাহারা যে কখন্ টুপ করিয়া খসিয়া নিচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তাই নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি সামান্য কাজের জন্য সকালেই বাহির হইয়াছি। সহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্ত্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দুমিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ!

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্য্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ও-দিকে যান নি—আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাস-খানেক থেকে ডিসেণ্ট্রিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠতে পারি নে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেছেন!

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কি না, চ'লে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধম্‌কে।

একটু আশ্চর্য্য হইলাম; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ যাহাদের জানা নাই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না, এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চোবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহাদের চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের আফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক! অবশ্য দুটাকা বেশি মাহিনা দিয়া তবেই এই ত্রিবেদী-চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function

একত্রে combine করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙালী বামুনদের আজিও এ কাজে রাজী করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জ্জন করিতেই হিন্দুস্থানীর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। (মুর্গী রাঁধাইতে আরও চার আনা আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্দ্ধের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্য্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে ত এই হিন্দুস্থানীরা—একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর এই combined handকে আমি কেন ধমক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক্ শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যাণ্ডটি মনোহরবাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—শুধু ডিসেণ্ট্রির খাতিরে অল্পদিন ইহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই, আপনি কি সহজ লোক! সহর শুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে বাঁচে, তা কি আর জানি নে ভাবচেন। বেশি নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চোদ্দবছর জেল হয়ে যাবে, সে আমি কি শুনি নি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ ক'রে শাসিত ক'রে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্য্যন্ত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা লোকের চোদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা অত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া, কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined

handকে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার!

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া যখন কাঁদ কাঁদ হইয়া হাত যোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে দেও' আছে, এখানে সে কোন মতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের 'ছায়া' রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অনায়াসে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর, তা ছায়ার আর অপরাধ কি; কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্য্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম। চুহা কি রে? এ ঘরে মরে না কি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা করিয়া ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কোরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না; কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় সহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই; এমন ভদ্র বাড়িআলাও আর নাই এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খৃষ্টান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্ট-শান্ত, তেমনি

অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন-ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন ?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কুঁচকী ফুলে উঠেচে। সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্য্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়া আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচ্‌কীও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিট-খানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠান্ নি কেন, শীঘ্র পাঠান্।

তিনি কহিলেন, মশাই যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়! আন্‌লেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল! তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দুটাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক্ ডাক্‌তে পাঠান।

কে যাবে মশাই ? তেওয়ারী ব্যাটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে ?

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি আপনার কে ?

বলিলাম, কেউ না, এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে ?

বলিলাম, জানি না ; বোধ হয় কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়ার দরকার ; কিন্তু সব চেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাক্‌বেন না এ ঘরে —আর দেখুন, আমাকে ফি দেবার দরকার নেই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই, মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, পিলেগ্‌ কথাটা ভারি বুঝে।

তখন আমাকেই যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া। এই ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা দুটা বাজিয়া গেল, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য সচেতন ভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিনশ

গিনি আছে—স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজ্‌লেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের মেসটা। তাহাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়া-চড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজায় তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে! বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারোটা বাজিতে চলিল কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেওয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে; কৌতূহল-বশে সেই ছিদ্র-পথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল! সুমুখের খাটের উপর দুজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম রোম্যান ক্যাথোলিক্‌রা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়! সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা-দুই ছট্‌ফট্‌ করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল।

কিন্তু তামাসাটা এই যে, যিনি জানা-শুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনি-পোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাত্রিটুকু আমার যে ভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, এ কথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে, বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক্, মনোহর ত ঠেলা গাড়ী চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ণ। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্য সত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ; কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক্, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলি-ব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানা-টানি করাটা সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এত বড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধু লোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে, নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্ত্তব্য নহে—অশাস্ত্রীয়।

সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর একপ্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা, পতিতা নারী আছে—এতদিন যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয়, সে মরুক! হয় ত তাহাতে কিছু পুণ্য-সঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ী আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

১২

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশি ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চল্‌লুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই; কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এত বড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সর্‌চে না অভয়া! এখনও গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে প্লেগ-হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্ত্তের জন্য মনটা শক্ত ক'রে বল, আচ্ছা যাও। অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল,

তোমাকে যাও বল্‌তে যদি পারতুম, তা হলে নতুন ক'রে ঘর সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'লো।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

আফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন আফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্ম্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র। আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই সর্ত্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমেই সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে, আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না, যাহা তোমার না জানিলেই নয়; কিন্তু আমার ত তা নয়। আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারো নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয় যে, তুমি ভাল আছ।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার একথা আমি অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো। আমার মাথার দিব্য রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া

আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়া সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্দ্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সে দিন আমি এমনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিয়ো যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটী নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড়, জানি না, জানার আবশ্যক নাই; তিনি শুদ্ধ মাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য! আজ আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে; গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোল-পাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্তর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা, নেবে না? বলিলাম, আমি মহাপাপিষ্ঠা। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশি দরকার মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিই নি, দিলে এ বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আস্‌বো না মা?

আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া

কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হ'তে হয়। সে কথা কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা; কিন্তু সে ভয় যার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, এক বাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয় ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়ে উঠে, যে দুর্ব্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটিই কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর একজন হয় ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বিধি-নিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম্ম, তা কি সবল-দুর্ব্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায়-অধর্ম্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা; বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্ব্বলে কোন প্রভেদ থাকৃত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্তত এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলচে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্ম্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।

শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই

অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতর যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইয়াছি। তাঁর কর্ম্মের বিচার একটু সাবধানে করিয়ো। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাট্‌খারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষী তোমাকে শত সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—এই নাও।

অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপর শত-যোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজি অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখ মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্তদাদা—

বাধা দিয়া বলিলাম, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে।

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়—সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ ক'রো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই সব মতলব আঁটা হচ্চে?

কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা

অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হয়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ বলে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাস-খানেকের ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্তদাদা। আমার মনে হচ্চে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই আফিসে চিঠি লিখিয়া আরও এক মাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাত্রার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?

স্বীকার করিয়া জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার নমস্কার করিল; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি; কিন্তু জাহাজের ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো, শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাই নে।

আচ্ছা, বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

১৩

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বঙ্কু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়ীতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেবে যান, আমি জিনিষ-পত্র নিয়ে পরে যাচ্চি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্ব্বাদে; আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ীর কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ী করে পিছনে আসিস্—দুটো বাজে, এখনো ওঁর নাওয়া খাওয়া হয় নি, আমরা বাসায় চল্লুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন, যে আজ্ঞে, বলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয় নি ত?

না।

বড্ড অসুখ করেছিল না কি?

অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়; কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্চে না। বাড়ী থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়ার কাছ থেকে তোমার আস্‌বার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আস্‌তেই ত হ'তো—দুদিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুন্‌বো; কিন্তু তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল, এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল; এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না; কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না, সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্চে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল, সে যেন কত দেশ দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিল—এম্‌নি ক্লান্ত, এম্‌নি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজের বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই—এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু যায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বল্‌লে না যে?

কহিলাম, নাই শুন্‌লে।

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না, বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখ্‌তে হয়ে গেছি। সত্যি!

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই-বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখা-দেখির ত সম্পর্ক নয় যে সে জন্যে আমাকে ভেবে মর্‌তে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই।

কারণ একে ত লোকে ও কথা তোমাকে বলে না, তা ছাড়া বল্‌লেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্যামী কি না, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচ! আমি কখ্‌খনো ও-কথা ভাবি নে। তুমি নিজেই সত্যি করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেম্‌নি কি এখনো দেখ্‌তে আছি না কি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েচে অন্ততঃ আমার চোখে।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসি মুখখানিই আমার মুগ্ধ দৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও-দেশের আব্‌হাওয়া কি সহ্য হচ্চে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই। যেমন ক'রে হোক্ সহ্য করিয়ে নিতে হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ যে দেশের জল বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল; কিন্তু সেরূপ হইল না। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এই প্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কি ভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রুতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্র প্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের ভিতরে ঝড় উঠিবে, দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে, কত রঙে ভরিয়া যে, দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই আমাকে সব চেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—কিন্তু থাক্ গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাহাই করি, সেই মরণ বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে যাইব না।

বৌবাজারের বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড় গে। আমি যাচ্চি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে আমার বইগুলি, আবার গুড়গুড়িটি পর্য্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্য্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্য্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেম্‌নি করিয়া দেয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজ সরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের চটি জুতাটি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরাম-চৌকি আমি সর্ব্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে

জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুর-বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলাম পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ণ-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা ক'রে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আস্‌ব ?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বঙ্কু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস্‌।

আমি আবার চোখ বুজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বঙ্কু ? একবার এ-দিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেম্‌নি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু ব'স! কি কি আন্‌তে হবে, একটা ফর্দ্দ ক'রে দরওয়ান সঙ্গে ক'রে একবার বাজারে যা বাবা। কিছুই নেই।

দেখিলাম এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে

বসিয়া আমাকে বাতাস পর্য্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা নয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বন্ধুর সম্মুখে অবধি দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বন্ধুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ!

জিনিসপত্রের ফর্দ্দ করিয়া বন্ধু প্রস্থান করিল। রতন চা ও তামাক দিয়া নিচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বল্‌তে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে। রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন ক'রেই জানি সত্যি কি না বলত?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক্, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন বলেই সংসারে এত বড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত এবং সে হিসাবে যা কিছু ইহার কঠিন দুঃখ, যা কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে কর্‌তে হয়েচে।

রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন ?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলি নি। পুরুষ-মানুষ বল্‌তে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত কর্‌চ সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। সখ ফুরালে, কিম্বা হালে পানি না পেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্য-গণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে—এই ত বল্‌চ ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে ? তুমি পারো ? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে আস্‌তে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্য্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচায়ে রাখ্‌তে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর ? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্ব্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎ-সর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, এ কোন মেয়ে-মানুষেরই সাধ্য নয় পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোন দিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদা-সিধা চুপ-চাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে

দেখিয়াছিলাম, তাহা চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু মুখে বলিলাম, চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে !

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই ! কেন না, আমার বিশ্বাস, যা কিছু পাপ, যা কিছু অপরাধ, সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ, নির্ম্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ। স্বামী পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে না কি ? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাক্‌লে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক্ ; কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকাল কিছু কিছু অত্যাচারী ; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাট্‌তে পারে না ! মেয়েমানুষকে সহ্য করতেই হয়, নইলে ত সংসার চল্‌তে পারে না।

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার ! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হলে তুমি আগুন আগুন কি বক্‌ছিলে ?

রাজলক্ষ্মী সহাস্য মুখে কহিল, কি বক্‌ছিলুম শুন্‌বে ? আজই ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েছি। আগুনটা কি জানো ? সে দিন প্লেগ বলে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘর-কন্নার দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে

নির্ব্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বল্‌চি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাতে ছিল না। কর্ত্তব্য বলে বুঝ্‌লে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, দ্বিধায় পিছুতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন বলে বকে মরছিলুম। আগুনের এক নাম সর্ব্বভুক্‌ জানো না? সে সুখ-দুঃখ দুইই টেনে নেয়—তার বাচ-বিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেচেন জানো? তিনি রোহিণীবাবুকে সার্থক করে তুলতে চান। কারণ তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়েই শুধু সংসারের অপরের জীবনে সার্থকতা পৌছাতে পারে। আর ব্যর্থ হতে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানাদিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না! বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল; তার পরে দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার মাথার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া রুক্ষ চুলগুলা নিরর্থক চিরিয়া চিরিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিতা না? নইলে এত তেজ হয় না।

বলিলাম, হাঁ, যথার্থ-ই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েছেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বরাবর চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে না কি? কৈ আমি ত শুনি নি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন্‌ মেয়েমানুষের নেই; কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!

কহিলাম, তা হলে তোমারও আছে নাকি?

যাও, বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল দুইটী হইতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিকমিক করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলে-মেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি—একটী দুটি নাতী-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। না হয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল

থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন তখন ব্যাণ্ডের কর্ণেট এবং ব্যাগ-পাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের ষ্টেশন-যাত্রার পথেও এম্‌নি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তা হলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না? তা হলে সৃষ্টি থাকে কি ক'রে?

তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে আর বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এ দেশে নেই বল্‌লেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর-করার সাধ-আহ্লাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্লাদ থাক্‌লেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই, আমাকে বুঝিয়ে দাও!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র নির্ব্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত দরিদ্র ভদ্র-গৃহস্থের সম্বন্ধেই, এবং তার কারণও তুমি জান বলেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে কহিল, তোমার ও মস্ত ভুল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুললেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বন্ধুর বাপ যখন

তোমাদের দু'বোনকেই এক সঙ্গে মাত্র বাহাত্তোরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সে দিন এখনো এত পুরোনো হয় নি যে তোমার মনে নেই। তবে নাকি সে লোকটার নেহাৎ পেশা বলেই রক্ষে; নইলে, ধর যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি একটি ছেলে-পুলে হ'তো— একবার ভেবে দেখ দেখি অবস্থাটা ?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই বা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এই জন্য ? এই সব ছেলে মানুষ করতে ?

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না হয় তিনি নাই দেখতেন; কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হ'তো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ী ক্রমশঃ সরকারী এবং বে-সরকারী অফিস কোয়াটার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসের কেরাণী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেণ ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু না কিছু খাদ্য সামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিঙড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাঁটার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরি-তরকারী এবং ফল-মূল, সাত দিনের পরে

গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলে-মেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্য মত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেণ ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমন ভাবে ইষ্টিশনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া হাসিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এঁরা সব অফিসের কেরাণী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্চেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন। পাড়াগাঁয়ে ত এ সব পাওয়া যায় না, তাই বোধহয় ছেলে-মেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্চেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ—ছেলে-মেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্তি, কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে—বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ীর জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ গা, এঁদের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরাণীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ ত্রিশ কুড়ি—এম্‌নি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে-পুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ—বাঙ্গালী কেরাণী জীবনের সমস্ত নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনা বোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের ঘর-কন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এঁদের চোদ্দ আনা লোকেরই কিছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, না হয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এঁদের ছেলে-মেয়েদের কথা শুন্‌বে?

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না, না, শুন্‌ব না, শুন্‌ব না—আমি চাই নে শুন্‌তে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রু সম্বরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতূহলের কাছে পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলে-পুলের কথা; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে ব'লো না। দোহাই তোমার!

তাহার মিনতি করার ভঙ্গী দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু

হাসিলাম না ; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষে করে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে ; অস্বীকার করলে নাস্তিক বলে হয় ত আবার আমাকে গাল-মন্দ করবে ; কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই ক'রো, আমি যা জানি তাই শুধু ব'লব। কেমন ?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব তার মায়ের উপরেই থাকে বলে আমার মনে হয়। ভগবানের ওপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস ; কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কি না—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ, চালাকি ক'রো না—সে আমিও জানি !

জানো ? যাক্, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল ; কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময়ে উপস্থিত থাকা আবশ্যক ; কিন্তু সে যখন পার্‌বে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা না হয় মেনেই নাও !

রাজলক্ষ্মী ম্লান মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার যো নেই। গরুই নেই তার আবার দুধ!

বলিলাম, যাক্, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল! তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানা-পুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটা ভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো; কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয় ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু সে সৌভাগ্য এ সব ঘরে বেশি দিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিয়া উঠিল, হাঁ হাঁ, জানি, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না। তুমি তার পরে বল।

কহিলাম, তারপর ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়ার জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্চে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুঁড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বল্‌লুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্ত্তি নেবার মুলতুবির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তার পরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে ক'রে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-কতক চ্যাচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাচানো কেন?

বলিলাম, ওটি মায়ের স্বভাব ব'লে। এমন কি কেরাণীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন।

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিক্‌টা অগোচরেই থাকিত! বাঙ্গালার ক্ষুদ্র চাকুরীজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময়ে রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক্ কেরাণী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল। তুমি ত পাষাণ! তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখ কষ্ট এমন আহ্লাদ ক'রে বর্ণনা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্চে। বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পৌছিতে এঁদের আগ্রহটাও ত ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্ত্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত তাই বল্‌চি। আজ বাবা আস্‌চে বলে ছেলে-পুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয় ত কম, তেম্‌নি বাবুয়ানীও নেই; কিন্তু তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা—এত কম? কখ্‌খনো নয়! অন্ততঃ একশ-দেড়শ টাকা, আমি নিশ্চয় বল্‌চি।

বলিলাম, হতেও পারে। আমি হয় ত ঠিক জানি নে?

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরাণীর জন্যও মাসে দেড়শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না।

কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপ্‌রিও ত কত পান?

কহিলাম, উপ্‌রিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখ্‌চি ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্চে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো বলেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো!

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত দুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ী রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্ব্বাহ্লেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম, যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতর গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে ছাড়ে। আমাদের ট্রেণ পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়-গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরি-তরকারীর পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়শুদ্ধ একটি মাটির পাখী লইয়া শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া একলম্ফে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বঙ্কু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কাণা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া

পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, দেখতে পাই নি মা, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েছে, আপনি শীঘ্র যান—আপনার ট্রেণ ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুক্‌রা কয়টা কুড়াইবার জন্য বার-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সে আর এক দফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙা অংশগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবার বাড়ি থেকে আস্‌বার সময় বলে দিলে আমার জন্যে একটি পাখী-পুতুল কিনে এনো না; কিন্‌তে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কি না—দু আনা—তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি ক'রে আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম; কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না, যে দোর-গোড়ায় এনে ভেঙ্গে গেল! রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বলবে, বাবা আন্‌লে না। যা হোক্ টুক্‌রোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সযত্নে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেচে—আমি দেখতে পাই নি, লোকসানকে লোক-সানও হ'লো, গাড়ীটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধ ঘণ্টা আগে গিয়ে দেখ্‌তে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বন্ধু পাঁড়েজীকে লইয়া কি একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া

যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগ্‌ল?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপি চুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেছে—কিন্তু সে এমন যায়গায় যে তোমার মত পাষাণের দেখ্‌বার যো নেই, বোঝ্‌বারও যো নেই।

শ্রীমান বন্ধুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ী রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্ষ্ট ক্লাসে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ী ছিল! কেন রেল কোম্পানীকে মিছে এতগুলো টাকা বেশি দেওয়া।

বন্ধুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠার বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুধু শুনিয়া গেলাম, কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন?

লোকটি কহিলেন, বর্দ্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপি চুপি বলিল, তা হলে ত উনি অনায়াসে আমাদের গাড়ীতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক্ না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ্ করিয়া বলিল, না না তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথাবার্ত্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এতক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বন্ধু এবং নিজের চাকর-বাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়ীতে উঠার দৃষ্টিকটুত্বটা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কী একটা বাজে লোককে গাড়ীতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এত বড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো! এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেণ ষ্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়ীতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য, তাঁহাকে রাজী করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধ মাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেণ গোটা-দুই ষ্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিল, আরও কয়েকটা ষ্টেশন উত্তীর্ণ

হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি আশ-পাশের গ্রামগুলার খবর পর্য্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাঁহাদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিস-পত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্দ্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে বাছিয়া একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ী বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক্ হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না না, মা, সরলাকে আমি আসচে বারে পুতুল কিনে দেব—আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা!

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশি দাম নয়। আর দাম যাই হোক্, এখানি তার হাতে দিয়ে বল্‌বেন, তার মাসি তাকে ভাল হয়ে পর্‌তে দিয়েচে।

ভদ্রলোকের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। আধ ঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন, সে ভাল হয়ে উঠুক, কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসি যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাক্‌লে বেঁচে যেতুম মশাই! এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চটপট সেরে উঠবে দেখ্‌বেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল ; তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুইজনের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখ দুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম এবং যে প্রশ্ন নিজেকে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায় ?

একখানা দশ বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয় ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্য্যন্তও করিত না ; কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না ; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যেদিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া ?

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অন্ততঃ দুঃসাহসের কাজ ; কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অধীর যৌবনের সমস্ত আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্ব্বস্ব দিয়া সংসারে উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই ; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা বাসনা

আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্য নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এখন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সে দিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, ততবড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই কাজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলে-খেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্য্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে সকলের সুখ দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্দ্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হলো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার যো

নেই। সে যাক্, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাই নে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে সে শুনে তোমার লাভ নাই!

কহিলাম, লাভের আশা করি নে—শুনে লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিম্বা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, তার বাপের জন্যে ঝরাটা আমি পছন্দ করি নে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা হুঁ বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না; ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে; কিন্তু সে ত হইলই না বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু বহুক্ষণ মৌন ছিলাম, কথা কহিবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, বর্দ্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দাও না! এ বিলেত-ফেরতের বিদ্যা শিখলে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি।

বলিলাম, হাঁ, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে।

কেন, তারা তোমাদের করলে কি ?

এখনো কিছু করে নি, কিন্তু পাছে কিছু করে এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে, সবদিক থেকেই বার করে দিয়েছ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্যে এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশি কৃতজ্ঞ হতুম, যদি তারা সেই রাগে পুরাপুরি খৃষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম সমাজকে নষ্ট করছে, যারা হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু সমাজকে ত্যক্ত করে মারছে। ওরা নিজেরা কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বস্‌তো, তাতে হয় ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্যে কাঁদে তাদেরও হয় ত একটু উপকার হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু আমার ত তা মনে হয় না !

বলিলাম, না হ'লেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে, সে অন্য কথা। কই—তার ত কোন জবাব দাও না।

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো সেজন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক্ তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও ষ্টেশন থেকে যা-মেলে খাবার কিনে গিল্‌তে দেবে—এই ত ? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখচি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া

থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয় ?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না ?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের ষ্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের যায়গাটা চাহিয়া লইল, এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্য সামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে এক বিন্দু ভুল চুক কোথাও নাই ; আমি যাহা কিছু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটী ভোজন সমাধা করিয়া গুড়-গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস্ খেগে যা—আর তোদের গাড়ীতে অন্য কেউ যদি খায় দিস্।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা এবং সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি খেলে না ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, আমার ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ী ছেড়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেছে। কত বলছি, মা, ইষ্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতরে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই যাবি না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি ?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন্; কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার কিন্তু দিয়ে লেক্‌চার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করি নে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করি নে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন?

কেন আবার কি? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না। পুরুষমানুষের জন্যে আবার এত বাঁধা-বাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক্, যা ইচ্ছে পরুক্, যেমন করে হোক সুখে থাক্, আমরা আচার পালন করে গেলেই হ'লো। আমরা শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি? এই যে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখ্‌ছিলে?

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে না পারাটা আমাদের গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, এতে তোমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয়, যে কষ্ট সহ্য করতে যাবে! লজ্জার কথা আমাদেরই, যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়-শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা কিছু শিক্ষা, সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তা হলে গুরুর কাছে ঠিক উল্টোটাই শিখে রেখেচ। আমি কোন দিন বলি নে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে, আমাদের চেয়ে এক তিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুটি সহসা ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এম্‌নি ক'রে ভাবতে পারতো, তা হলে পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুন্‌তে পেতে। কে বড়, কে ছোট এ সমস্যাই কখনও উঠ্‌ত না।

অর্থাৎ এ সত্য নির্ব্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, ভাগ্যে পৃথিবী শুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা; কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে না?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ; অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, তা বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এম্‌নি বদ্ধমূল, যে এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধকরি এই পাপেই পৃথিবীর

সকল দেশের মেয়েদের চেয়ে তোমরাই আজ সত্যি সত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে করে ছোট হয়ে যায় নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে করে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যেটুকু ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটীর সম্বন্ধে তামাসা করছিলে; কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে ত জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপ্সা হয়ে থাকে। একদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে!

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুঝ্‌বে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকো নি, কখনো এদের সুখ দুঃখ ভোগ করো নি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা করে ভাব্‌তে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে কোন দরিদ্র প্রজাকে

পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেম্‌নি ভুল হয়েচে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্চে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি, কি করে, জান্‌লে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাক্‌বে ? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে নাকি ? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জান্‌বে কোথা থেকে ! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায়, যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল করে পরের সমাজ, না জানো ভাল করে নিজেদের সমাজ !

বলিলাম, তার পরে ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে বলে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়েরা নেই ; কিন্তু দিন-কতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি ! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে ?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাসা কর্‌চ, তা জানি ; কিন্তু তামাসা করবার কথা আমি বলি নি। বাড়ীর গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়। অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশি খাট্‌তে

হয়; কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অম্‌নি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু দেশের রাণী করে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই বল্‌চি।

বলিলাম, তর্ক-শাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোববার যো করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চি নে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিছুই নেই।

বলিলাম, থাক্‌লেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে; কিন্তু তোমার কথাটা এক রকম বুঝতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জন্যেই হোক্‌, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েচে, সে আমিই টের পেয়েচি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমাদের এই দশা; কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানি নে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্‌খনো ছিল না। সেকালে কখ্‌খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না! তখন ধর্ম্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের বেশি সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যি এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, আঁচল দিয়া চোখ দুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে সুরু করিলে, বলিলাম, কি করলে তোমার বাকি জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকা-কড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিচ্ছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হ'লেই—

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ার কথা শুনেচি, সেই দিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবন-যাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানি নে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক্, আমার মত দুঃখ যে তারা কোনদিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বল্‌চি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে

ত্যাগের কথা মুখে আন্‌চো কেন? তোমাকে ত কিছুই ত্যাগ কর্‌তে বলি নি!

বলিলাম, বল নি বটে কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষ-মানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জ্জন দিতে হবে না; কিন্তু তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোর মত ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্‌ আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি ঘুমোও—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও ক'য়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথা সময়ে কাশী আসিয়া পৌছিলাম এবং পিয়ারীর বাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এঁরা সব আমার ভাড়াটে। বলিয়া মুখ ফিরিয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাস্‌লে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায়

আমাকেই খাওয়া-পরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। বেঁচে থাক্‌লে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না ?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বই কি। এমনি ধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্ন-বস্ত্র যোগাতে হয় আমি তাই শুধু ভাবি।

তা ছাড়া দু-একজন কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি ? কিন্তু জান্‌লে কি করে ?

পিয়ারী একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই ? তখন অসময়ে যাঁরা আমাদের সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাক্‌তে ভোলা যায় না কিনা !

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেছি, লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে রাজলক্ষ্মী !

মলে দেখো। আচ্ছা ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরী হলে তোমাকে তুল্‌ব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম।

গুরুদেব তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত ?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আস্তে চাই।

পিয়ারী বলিল, বন্ধুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরি আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুস্কিলে পড়িলাম। আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া সেখানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমিষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয় ত কেউ দেখে ফেল্‌তেও পারে, না ?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক, দুর্নাম জিনিষটা এম্‌নি যে লোকে মিথ্যে দুর্নামেও ভয় না করে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে এক রকম কোলে নিয়েই আমার রাত কাটত। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলে নি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনা-শোনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না ?

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা। মানুষ হিসেবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম ? ছ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিঙিয়ে যেও না।

একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলঙ্কই বটে ; কিন্তু আমি হলে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার কর্‌তে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েচ—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোট মানুষ রাজলক্ষ্মী ; তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিই নি। সে জন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না ; কিন্তু ছোট মানুষ বলে যে তোমাকে ভাব্‌তে পারি নি ! তা হলে ত বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্ত্তা বন্ধ না কি ?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বল্‌বে ?

বলিলাম, চল, প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি ?

চাও না ?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না। বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুর-বেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে কি তুমি থাক্‌তে পারো যে, এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কর্‌চ।

রাজলক্ষ্মী শান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, সাম্‌নে থাক্‌লে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়!

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও এক রকম স্পষ্টই জানিয়েচ আমিও এক রকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি; কিন্তু—

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না! কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মর্‌চি—, বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাব্‌চে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে কর্‌চে! ছি ছি, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে এ সব কি আমার সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও! তবে পারো যদি, বর্ম্মা যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্দ্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এ সব মান অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্য সত্যই কি একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকাল-বেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই পিয়ারীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ি নাই, সাজসজ্জা করিয়া, জুড়িগাড়ী চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়িগাড়ীই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না—তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সম্বাদে বিস্বাদ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বলিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়ীতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ি ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

১৫

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমিও লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস্ না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল, তা হলে কি কর্‌তে?—খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী সখ নেই। তা ছাড়া এই বিংশ শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারের এই এতবড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ ক'রে দেবে? বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক্, তোমার কণ্ঠ বীণানিন্দিত এবং ঐ ছুটি চরণ-কমলের নৃত্য উর্ব্বশী-তিলোত্তমার গর্ব্ব খর্ব্ব করুক্—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই!

পিয়ারী কহিল, এ সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থং! সে যাক্ আমি এই একটার ট্রেণে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙালীর পরমতীর্থ চাক্‌রীস্থান—অর্থাৎ বর্ম্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে করো না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চলে যাচ্ছো?

বলিলাম, পাপমুখে এখনো বল্‌তে পারি নে। এ গোলক-ধাঁধা যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার কর্‌তে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যা-চার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো ক'রে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি!

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চ'লে যাবে?

হাঁ।

আমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, কেন গিয়েছিলুম, শুন্‌বে না?

না। আমার মত নিয়ে যাও নি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে। যাবে, যাও—, বলিয়া রূপ ও অহঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টা-খানেক পরে সদর-দরজায় একখানা গাড়ী থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলে-খেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চ'লে যাবে, চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাব্‌বে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া ক'রো—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা না হয় হ'লো, কিন্তু ফিরে গিয়ে বন্ধুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে, সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা ক'রে

থাকি, তার কি মাপ নেই ? তুমি ক্ষমা না কর্‌লে আমাকে আর কে কর্‌বে ?

বলিলাম, পিয়ারী, এ যে দাসী-বাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্চে না !

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্ত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্‌ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো কর্‌তেই পারি নে, তা জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিয়ো না। আজ এমন ক'রে তুমি চ'লে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পার্‌বো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা, আজ তোমার আমার একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক্‌। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম ; কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন ?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য কর্‌তে পার্‌বে ?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল ; কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব

না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মি, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক্, আমি কর্‌লুম; কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিষ আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে পারো, শ্রদ্ধা কর্‌তে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতে পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এ রকম কাজ আমি মাঝে মাঝে কর্‌বই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়্‌বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দুচোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল; কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নয়, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো কর্‌তে পারো না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার

সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিন্‌বে না, তারা চিন্‌বে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হয়ে যাবো, সে কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছো না? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না।

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হ'তে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয় লক্ষ্মি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি; কিন্তু তাঁর চক্ষুও ত সর্ব্বদা দেখা যায় না। যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী। তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্ম্মা যাবার পূর্ব্বে আমি একবার দেখা ক'রে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও; কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ ক'রে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম্ম, এ কথা আমি কখনো মান্‌বো না। বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয় ত একটার ট্রেণ ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

বক্‌শিসের লোভে গাড়ী প্রাণপণে ছুটিয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পশ্চিমের ট্রেণ প্লাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

খবর লইয়া জানিলাম, আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেণ কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্ত্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই আধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয়শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্ণ-বেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘর-দুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া তাহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হ শ্রীকান্ত, আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।

বলিলাম, সেই জন্যেই ত এসেছি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই!

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাইরের ঘরেই না হয় থাক্‌ব।—ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এককোণে চুণ এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত! এগুলো দেখে শুনে কোথাও একটু সরাতে হবে দেখছি। এ ঘরটা ত ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তক্তপোষ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত?

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত না হয় তাই হোক্।

বস্তুতঃ এম্‌নি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক্ একটু

শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্ষায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা যখন টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল তখন বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

তথাস্তু। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙিল —বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছু না। ওটা ম্যালোয়ারী। ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয় ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দ ডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিভ দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র কেনা দাম-টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক্—তোমার পিসিমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা একটু মুস্কিলে

পড়িয়াছেন। এম্‌নি ভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দ ডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বক্রী কেনা দাম-টুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোন মতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দ ডাক্তার ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়েছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায় নি কিছুই।

কিন্তু তাহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক্, তুমি আমার পর নয়, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম একথা কেউ যেন না শোনে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়ার প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাসা করিতেছে। কারণ সংসারে এমন নির্ব্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, এ কথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম না। প্রথম হইতেই স্থির

করিয়াছিলাম, এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলে যাহা হয় করিব—সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যত্নের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়া হোক, আমার বিপদ্‌টা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন—এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এম্‌নি কাটিল; কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সে দিন কোন দিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একবারে মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এম্‌নি সময়ে দূরে একখানা গাড়ীর শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি কোচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া রতন। সে নিচে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের-বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। গাড়োয়ান কহিল, মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও, বলিয়া সে অবিচলিত ধীর-পদক্ষেপে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, হাত দিয়া আমার কপালের বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নাই। ও-বেলায় সাতটার গাড়ীতে যাওয়া চল্‌বে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বল্‌ব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এই দুদিন জ্বরটা বন্ধ হয়েছে; কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না হয় আজ থাক্। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই; হিম লাগতে পারে, কাল সকালেই যাবো।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন্ সাহসে? তুমি কি মনে কর, তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক। এইখানে মানুষ হ'লাম আর এখানে আমাকে চিন্‌তে পারবে না? যে দেখবে, সেই ত চিনবে।

তবে?

কি কর্‌ব বল। আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হ'তো।

তা কি কখনো হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাকতে পারি?

বলিলাম, তুমি না হয় স্থির হলে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির ক'রে তুল্‌লে। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি ক'রে, আর আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেব—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে; কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেম্‌নি উদাস-কণ্ঠে উত্তর দিল, লজ্জা-সরম আমার যা কিছু এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবই বা কি! শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুর বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আস্‌ছো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েছি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কল্‌কাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হ'লে—তার পর—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেইখানেই রেজেষ্ট্রী করতে হবে। লেখা

পড়া সব এক রকম করে রেখেই এসেছি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র? কাকে কি দিলে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি দুটো ত বঙ্কুকেই দিয়েচি! শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে দেব ভেবেচি। আর কোম্পানীর কাগজ গয়না-টয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি বিবেচনা মত এক রকম ভাগ করে এসেচি, এখন শুধু তুমি বল্‌লেই—

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজের রইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হ'লো, যদি শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?

আমি কি তাই চাইচি না কি? নিজের সমস্ত দান করে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ!

অধৈর্য্য আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশ্চন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিল কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমার বুদ্ধি যে দিয়েচে সেই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাব্‌বে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম ক'রো না—স্থির হয়ে শোও।

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যকররঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভায়-সৌন্দর্য্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের

মধ্যে রোগ শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্ব্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুরদাদাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদাদা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ী করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেইজন্যই বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদাদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্চে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো আমারও যেন মনে হচ্ছে, এঁকে কোথায় দেখেচি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমিষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব, এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি

স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদাদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখোচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

সম্পূর্ণ
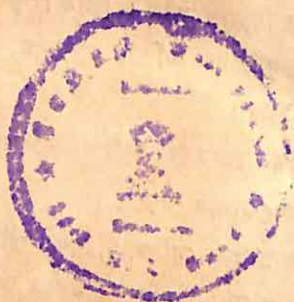
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬